বণিক বার্তা
রেজি. নং : ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ০১, সংখ্যা ৩০৬ www.bonikbarta.com | সমৃদ্ধির সহযাত্রী

East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

বণিক বার্তা, ২০১৯-০৬-২৯, পৃঃ- ০৪

পর্যালোচনা

বাজেট নিয়ে কিছু কথা ও পথনির্দেশনা

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন কাঠামো

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটটি গত এক দশকের অর্জনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। সামষ্টিক অর্থনীতির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ৩ শতাংশ এবং মূল্যস্ফীতি ৫ দশমিক ৫ শতাংশ অর্জনযোগ্য। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অর্জনযোগ্য, তবে কাঠখড় বর্তমানের চেয়ে বেশি পোড়াতে হবে। তখন হয়তো মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার হবে আর জনসংখ্যা বৃদ্ধি বছরে শূন্য ১ শতাংশের বেশি হবে না। একটি লগারিথমিক ফর্মুলা থেকে জানা যায়, বার্ষিক শূন্য ৯ শতাংশ চক্র বৃদ্ধিতে একটি সংখ্যা আট বছরে দ্বিগুণ হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪-এ বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার এবং ২০৩২ সালে ৫ হাজার ডলার হবে। ২০৪০ সালে এটি ১০ হাজার ডলারে উন্নীত হয়ে জনবন্ধু শেখ হাসিনার ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবে। বাস্তবে রূপ নেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলার স্বপ্ন। তবে এ পথপরিক্রমার বিস্তারিত কোনো বর্ণনা ও বিশ্লেষণ কিন্তু বাজেট দলিলে নেই। ২০৩০ সাল নাগাদ তিন কোটি নতুন চাকরি সৃষ্টির যে প্রস্তাব বাজেট ২০১৯-২০-এ রয়েছে, তারও কোনো চলার পথ বলা হয়নি। এর অর্থ হচ্ছে বছরে ২৫ লাখ নতুন চাকরি সৃষ্টি হবে—বছরে যে সংখ্যায় লোক শ্রমবাজারে প্রবেশ করে তার সমান। শুনতে ভালো লাগছে হয়তোবা সম্ভবও হতে পারে। তবে আজকের এই কর্মসংস্থানবিহীন প্রবৃদ্ধির যুগে এ প্রস্তাবিত পথপরিক্রমার সন্ধান বাজেটে পাওয়া গেল না।

সমৃদ্ধি সোপানে বাংলাদেশ

দি ইকোনমিস্ট ১২ এপ্রিল, ২০১৭ সালের সংখ্যায় জানান দেয় যে, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় পাকিস্তানের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। তারা এও বলে, ভারত-পাকিস্তান যৌথভাবে যে পরিমাণ তৈরি পোশাক-নিটওয়্যার রফতানি করে, বাংলাদেশ একাই তার চেয়ে বেশি করে। দ্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক হিসাব করে দেখিয়েছে ২০৩০ সালে মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে ভারতকে (৫৪৩২ মার্কিন ডলার) টপকে যাবে বাংলাদেশ (৫৩৩৪ মার্কিন ডলার, দ্য ডেইলি স্টার, ১৫ মে ২০১৯)। ব্লুমবার্গ ও বিশ্বব্যাংকও অনুরূপ হিসাবের কথা জানিয়েছে। আর এ দুটিই উপরে বর্ণিত লগারিথমিক মডেল প্রদত্ত প্রাক্কলনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। আইএমএফের পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি (পিপিপি) ডলারে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন পৃথিবীর ৩০তম অবস্থানে, আগামী আড়াই দশকে এটি ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক বাঘা বাঘা অর্থনীতিকে পেছনে ফেলে ২৩তম অবস্থানে উঠে আসবে। প্রখ্যাত অনেক অর্থনীতিবিদ এবং প্রতিষ্ঠানের হিসাবমতে, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন সর্বোচ্চ তিনটি প্রবৃদ্ধির দেশগুলোর অন্যতম। যে সযতন পথপরিক্রমা ও উন্নত ব্যবস্থাপনা অব্যাহত একমুখী ক্রমবর্ধমান হারের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির ধারাকে ধরে রাখতে পারে, তার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ কিন্তু বাজেটে পাওয়া গেল না। তবে প্রয়াত ড. মাহবুবুল হক ও নোবেল বিজয়ী প্রফেসর অমর্ত্য সেনসহ অনেক বিজ্ঞজনই বাংলাদেশের দৃষ্টিনন্দন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং এর হৃদয় উষ্ণ করা সামাজিক অগ্রগতির হিসাবকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করছেন। প্রফেসর সেনের মতে, সেই যে বঙ্গবন্ধুর আমলে গণখাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে পরিমিত বিনিয়োগ করা হয়, তারই সুফল আজ অবধি পাওয়া যাচ্ছে।

প্রস্তাবিত বাজেটের দুর্বলতা কোথায়?

এসআরও দিয়ে বাজেট বাস্তবায়ন না করার আশ্বাসটি আশা করি রক্ষা করতে পারবেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

পরীক্ষামূলকভাবে শস্য বীমার পুনরাশ্বাস ২০১৫-১৬ বাজেটের এ প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন না হওয়ার নির্মম সত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এও মনে রাখা দরকার, গত এক দশকে বাজেটের খরচ ৯৯ হাজার কোটি টাকা থেকে ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তবায়নের হার কমেছে ২০১১-১২ সালের ৮৭ শতাংশ থেকে ২০১৭-১৮ বাজেটে ৭৮ শতাংশ (যুগান্তর, ১৩ জুন ২০১৯)। বাজেটের প্রাক্কলন ও মোট সামষ্টিক আয় ১৮ শতাংশ থিতু হয়ে আছে, ২০ শতাংশে বাড়ার কোনো লক্ষণ নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে ঠিকই বলেছেন, বাজেট যদি বাস্তবায়ন না হয়ে থাকে, তাহলে এত অগ্রগতি কোত্থেকে এল! কথা হচ্ছে, আরো বেশি হারে বাস্তবায়ন হলে আরো উপরে চলে যেত তার সোনার দেশ।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে রাজস্ব জিডিপি অনুপাত বাংলাদেশে সর্বনিম্ন ১১-১২-এর মতো। অন্য দেশগুলোর মধ্যে এটি ভুটানে ২০, চীন ও মালদ্বীপে ২৮, নেপালে ২৬, আফগানিস্তানে ২৫, ভিয়েতনামে ২৪, ভারতে ২১ ও শ্রীলংকায় ১৬ (যুগান্তর ১৩ জুন ২০১৯)। লক্ষণীয়, গণতন্ত্রায়ণের কঠিন পথপরিক্রমা এবং ২০১৬-১৭ সালের মারাত্মক ভূমিকম্পের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে নেপাল গত তিন বছরে রাজস্ব জিডিপি অনুপাত ১৭ থেকে ২৬-এ উন্নীত করেছে। বিশ্লেষকদের ধারণা, দেশটিতে ২১টি প্রদেশে ভাগ করা এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় খেলাপি ঋণ আদায়ে কৃত সংকল্প ও কঠিন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুফলেই এ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশেও তেমনি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়াও সেই ১৯৮৪ সালে শুরু করা কর প্রশাসনকে শতভাগ অটোমেশনে যাওয়া এবং দৃঢ় অথচ ভদ্রভাবে করজালের বিস্তার করা জরুরি। বাজেটে ২২ লাখ থেকে ১ কোটি করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলা হলেও পথ চলার দিকনির্দেশনা নেই। উপজেলা ও আরো নিচে কর দপ্তর নিয়ে যাওয়া একটি ভালো প্রস্তাব। কিন্তু এটি একা যথেষ্ট হবে না। সতর্কভাবে মোলায়েম ভাষায় এবং সুপ্রশিক্ষিত চৌকস জরিপকারীদের মাধ্যমে হালের করদাতাদের ওপর থেকে চাপ কমিয়ে নতুন করদাতা চিহ্নিত করা জরুরি। বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ ২০১৬ সালেই বলেছিল, বাংলাদেশে গড় মাথাপিছু ৪ হাজার মার্কিন ডলার আয়ের লোকসংখ্যা সোয়া কোটি। অন্তত তাদের সবাইকে করের আওতায় আনার জন্য সমালোচনার পথ পরিহার করে সবাইকে নিয়ে একযোগে নতুন করদাতার সন্ধান পেতে হবে। বিভিন্ন পেশা, বড় বড় উপার্জনকারী এবং ব্যক্তি ও গণখাতের রুই-কাতলাদের 'পার্কস' বা কমিশনসহ উপরি আয়ের সন্ধান করা তেমন কঠিন নয়। এখানে করজাল বিস্তারিত হলেই পে-রোল ট্যাক্স অনেক বৃদ্ধি পাবে। দরকার সরকারের কৃত সংকল্প।

রাজস্ব আদায়ে আরো পদক্ষেপ

বহুপ্রতীক্ষিত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক কর আইন, ২০১২ নতুন অর্থবছরে কার্যকর হবে। সাধারণত মূসক থেকে রাজস্ব আদায় অনেক বৃদ্ধি পায় (১৯৯২-৯৩ অর্থবছর)। এবারো এ সর্বজনীন আইন থেকে রাজস্ব বৃদ্ধি আশানুরূপ হবে তো? কিছুটা শঙ্কা এ কারণে যে বহুদা স্তর ও হার এবং নিম্নতম হার ৫ শতাংশের ব্যাপক প্রাধান্য অবশ্যই দুর্বলতা সৃষ্টি করেছে। হিসাবপাতি করার যে মেশিনটি আমদানি করার কথা তিন বছর আগেই, তা আসতে নাকি আরো ছয় মাস লাগবে। ধরে নিচ্ছি ভ্যাট তথা মূসক আদায়ে পারদর্শী উপযুক্তসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী তৈরি করা হয়েছে বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের

> ২০৩০ সাল নাগাদ তিন কোটি নতুন চাকরি সৃষ্টির যে প্রস্তাব বাজেট ২০১৯-২০-এ রয়েছে, তারও কোনো চলার পথ বলা হয়নি। এর অর্থ হচ্ছে বছরে ২৫ লাখ নতুন চাকরি সৃষ্টি হবে। শুনতে ভালো লাগছে, হয়তোবা সম্ভবও হতে পারে। তবে আজকের এই কর্মসংস্থানবিহীন প্রবৃদ্ধির যুগে এ প্রস্তাবিত পথপরিক্রমার সন্ধান বাজেটে পাওয়া গেল না

(এনবিআর) বক্তব্য শতভাগ সত্য। তবু প্রশ্ন থেকেই যায়, ছয়টি সরকারি সংস্থা, পেট্রোবাংলা, বিপিসি, বেসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থা, পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তর এবং বিটিআরসির কাছে বকেয়া পাওনা মূসক ২২ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা জোরে চাপ দিয়ে আদায় করা সম্ভব বলে কি না। অনেক বেসরকারি মূসক আদায়কারী সংস্থা নাকি আদায়কৃত মূসকের অর্ধেক টাকা নিজেদের কাছেই দীর্ঘদিন রেখে দেয়, একে অনেকেই তহবিল তছরুপ বলে মনে করেন। বর্তমান অর্থবছরে যেন এমনটি না হয়। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার অধীনে ২৫ হাজার টাকা ঝুলে আছে। এনবিআরের কর্মকর্তারা যদি তাদের হিসাব ঠিক বলে অনড় না থেকে খানিকটা নমনীয় হন এবং কর্মরীতিটি যদি এ মর্মে সংশোধন করা হয় যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে আসা সংক্ষুব্ধ করদাতার উচ্চতর ন্যায়ালয়ে স্থগিত আদেশটি এখানে হেরে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে যাবে, তাহলে বছরে অন্তত ৫-৬ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় নিষ্পত্তি হতে পারে। দুঃখের দিনের সরকারি ভর্তুকির জিয়নকাঠির সুবিধাভোগী এখন সরকারি নীতির আনুকূল্যে লাভের মুখ দেখা বিপিসি যদি এর বার্ষিক লাভের অর্ধেক অর্থ কোষাগারে জমা দিতে অস্বীকৃতিতে অনড় থাকে, তাহলে বিকল্প আমদানিকারক নিয়োগ করা হলেও এ খাতের উদ্বৃত্ত সরকারকে পেতে হবে। রাজস্বের ওপর করহারের স্থিতিস্থাপকতা হিসাব করে অন্তত সর্বনিম্ন স্তরের (সাধারণ ক্ষেত্রে ২,৫০,০০০ টাকা) করহার ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা যেতে পারে। মূলধন বাজারে বিশেষভাবে পারদর্শী জ্ঞানী অর্থমন্ত্রী মহোদয় স্টক ও বোনাস শেয়ারে এবং রিটেইনড আর্নিংসে যে কর ধার্যের চাপ সৃষ্টি করেছেন, তা সমর্থনযোগ্য। তবে হারটি ১৫ না হয়ে ৭ দশমিক ৫ হতে পারত। স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর লেনদেন থেকে কর রাজস্ব আদায় অভিনন্দনযোগ্য। মূলধন বাজারে আস্থার সংকট কখনই কাটেনি। বুক বাইল্ডিং মেথড, সম্পদ পুনর্মূল্যায়নে প্রশ্নবিদ্ধ রীতি, নিরপেক্ষ পরিচালকের চয়ন ও পুরো দক্ষতা পাওয়া এবং বিনিয়োগ নিরুৎসাহকারী ২ শতাংশ ইকুইটি না হলে পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন হবে না—এসব বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ করা জরুরি।

অন্য বড় প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) সঠিকভাবেই হিসাব করেছে যে বাংলাদেশের প্রান্তীয় মূলধন উৎপাদন অনুপাত (ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও, আইকোর) এখন ৪ দশমিক ৪-এ উঠেছে। তাহলে সামষ্টিক আয়ের ৩২ শতাংশ বিনিয়োগ দিয়ে বর্তমান অর্থবছরে ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয় কী করে? সম্ভবত একটি সুপ্ত কর্মক্ষমতা জাগ্রত হচ্ছে অবকাঠামো সেবা বেশি বেশি প্রাপ্ত ও নিয়োজিত হওয়ার ফলে।

রাজস্ব জিডিপি অনুপাত স্থবির অথচ বিনিয়োগ জিডিপি হার কিছুটা হলেও বাড়ছে, তা-ইবা হয় কী করে? ব্যাংকিং খাতের (অ)ব্যবস্থাপনা ও খেলাপি ঋণের বর্ধমান গতিতে সদাশয় সরকার কেন নিশ্চুপ, তা বোঝা মুশকিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবেই বর্তমান খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা আর একেবারে অর্থহীন নৈতিক বিপর্যস্ত সুদ অবলোপনের পরিমাণ ৪৫ হাজার কোটি টাকা। এই দেড় লাখ কোটি টাকা আটকে থাকা ব্যাংক খেলাপি আদায়ে নরমে-গরমে-কৌশলে আইনের আশ্রয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা খুবই জরুরি। যতই আদায় বাড়বে, ততই তারল্য বিষয়ে বৃহত্তর স্বস্তি আসবে এবং ঋণসুদ নিম্নগামী হবে।

বাজেটের একটি বড় নেতিবাচক দিক হচ্ছে বিনিময় হারে ত্রিধাবিভক্তি। বর্তমানে বিদ্যমান হার, প্রবাসী রেমিট্যান্স হারে ২ শতাংশ 'প্রণোদনা' আর রফতানিতে ১ শতাংশ অতিরিক্ত 'প্রণোদনা'। এ রকম বহুধা বিনিময় হার অত্যন্ত মজবুত অর্থনীতির ভিতের ক্ষতি করে ফেলতে পারে এবং এমনটি অন্য কোনো দেশেও করা হয় না। সমাধান হিসেবে সদাশয় সরকার অতিমূল্যায়িত টাকার সমুচিত অবমূল্যায়ন করে টাকাকে সজ্ঞানে অবমূল্যায়িত ভারতীয়, ভিয়েতনামি, ইন্দোনেশিয়ান ও পাকিস্তানি মুদ্রার পাঁচ বছর আগেকার আপেক্ষিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করতে পারে। এতে রফতানি বৃদ্ধিতে আরো শক্তি সঞ্চয় হবে। রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি জোরদার হবে। যুক্তরাজ্য ও চীনের বাণিজ্য সংরক্ষণের নামে 'শুল্কযুদ্ধ' কয়েকটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য বিশাল সুবিধা আনবে (ফুটওয়্যার, খেলনা, খেলাধুলার সামগ্রী, সাইকেল ইত্যাদি শ্রমঘন পণ্য)। বিনিময় হারে যৌক্তিক নমনীয়তা, ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন করে এ সুযোগ কাজে লাগানোর এই বাজেটই উত্তম ক্ষেত্র হতে পারে। ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সম্ভবত উত্তম হবে ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে স্থিতাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা এবং সুদ অবলোপনের অযৌক্তিক বিধানটির পুনর্বিবেচনা করা।

বিনিয়োগ, যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ

বাজেট ২০১৯-২০-এর অতি উত্তম উদ্ভাবন হচ্ছে যুব কর্মসংস্থানে স্টার্টআপের জন্য ১০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা। ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী যে পাঁচ কোটি যুবক ও যুবনারী রয়েছে, তাদেরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাধীনে এনে সিদ্ধহস্ত মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায়। ক্ষমতায়িত পরিকল্পনা কমিশনে নতুন নতুন প্রকল্প তৈরি করার ব্যবস্থা নিয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্রের আদলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যোক্তা তৈরির ইনকিউবেটর সৃষ্টি করে উদ্যমী যুবক ও যুবনারীকে বিশেষ করে অতিক্ষুদ্র (মাইক্রো), ক্ষুদ্র (স্মল) ও মধ্যম (মিডিয়াম) পরিধির শিল্প ইউনিট অর্থাৎ এসএমই খাতে স্টার্টআপ এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বরাদ্দে সামষ্টিক অর্থনীতির পরিধিতে বড় সম্প্রসারণের চেষ্টা করা যায়। অবশ্য গ্রাম-গ্রামান্তরে গুচ্ছ গুচ্ছ গৃহের সুযোগে মাথাপিছু সাশ্রয়ী খরচে সৌরবিদ্যুৎ এবং অত্যন্ত সাশ্রয়ী সুদে ব্যাংকঋণ প্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে। ২০০৩ থেকে ২০১৩ দশকটিতে একটি জরিপ করা হয়। এতে দেখা যায়, ওই সময়ে এসএমই ইউনিটের সংখ্যা ৩৭ লাখ থেকে ৭৮ লাখে বৃদ্ধি পায় (দ্য ডেইলি স্টার, ১ জানুয়ারি ২০১৬)। স্মর্তব্য যে জাপান ও যুক্তরাজ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পেই মোট কর্মসংস্থানের ৬০ শতাংশের বেশি চাকরি সৃষ্টি হয়। এ দেশেও এসএমই ফাউন্ডেশনে গতিময়তা এনে এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় সমভিব্যাহারে একটি বড় ধাক্কা দিয়ে শিল্পায়ন, স্বকর্মসহ কর্মসংস্থান এবং জিডিপি বৃদ্ধিতে উল্লম্ফন চেষ্টা করা যেতে পারে।

বাজেট ঘাটতি ও এর অর্থায়ন

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটেও ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশ দেখানো আছে। এতে ঘাটতির পরিমাণ ১ লাখ ৪৫ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা। তার মধ্যে বৈদেশিক সূত্র থেকে ৬৮ হাজার ১৬ কোটি টাকার যে প্রাক্কলন করা হয়েছে, তা বোধ হয় খুব সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য। কারণ এক্ষেত্রে পাইপলাইন গত কয়েক বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। গত বছরও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ সূত্র থেকে ৬০০ কোটি ডলারের সমতুল্য অর্থ খরচ হয়েছে। বাস্তবায়নে আরো মনোযোগ দিলে এ খাতে সাফল্য আসবে। এ নিবন্ধে উল্লেখ করা পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হলে রাজস্ব আদায় বাড়তে পারে এবং বাজেটে ব্যাংক খাত থেকে সরকারের ৪৭ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার পরিমাণ কমতে পারে। সহজ হতে পারে সরকারি ঋণ নিয়ে ব্যাংকিং খাতের ব্যক্তি খাতের ঋণপ্রবাহে বাধা অপসারণের শক্তি বৃদ্ধি করা। কেন জানি না প্রায় প্রতি বছরই বাজেটের সময় সঞ্চয়পত্র নিয়ে খুব নেতিবাচক মাতামাতি হয়। খুবই বিনীতভাবে নিবেদন করি, এতে যে লভ্যাংশ, তা সামাজিক সুরক্ষার সমতুল্য। এ হার কমানো সঠিক হবে না। এর ওপর আয়কর বাড়ানো তো দূরের কথা, বিদ্যমান ৫ শতাংশ কর উঠিয়ে দেয়ার কথাও বিবেচনা করা যায়। তবে একশ্রেণীর অসাধু ব্যক্তি সিলিংয়ের বেশি সঞ্চয়পত্র কিনে ব্যবসা করেন। উর্ধ্বসীমা খুব পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করে ই-টিন আইনের মাধ্যমে কেনাবেচা নিয়ন্ত্রণ করা গেলে অবশ্যই সঞ্চয়পত্রের বিক্রি ও স্থিতি কমে যাবে। কমবে লভ্যাংশ এবং সুদ খাতে সরকারের ব্যয়।

পরিশেষে ঋণের মান উন্নয়ন তথা অপচয় রোধে অর্থবছর জানুয়ারি-ডিসেম্বর এবং কর্মসপ্তাহ সোম-শুক্রবারে সমন্বয়ন্তর করা যায় কিনা, তার বিবেচনার সুপারিশ পুনরায় ব্যক্ত করছি।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ এবং সমাজকর্মী
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর; বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব